‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬’: কী পথ দেখাবে?

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

বাকস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার বিকাশ আমাদের সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি। বায়ান্ন থেকে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের পেছনে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আদায়ের বিষয়টি অন্য অনেক বিষয়ের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পর তেতাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেই স্বাধীন মত প্রকাশের পথে আমাদের অর্জন কতটুকু? আমরা কি পেরেছি স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী শাসকদের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে পেছনে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে? রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে আমরা কতখানি গণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিফলন দেখি? সর্বোপরি আমরা কতটা স্বাধীন?

আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার কারণে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক নির্ধারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রের তার নিজের গণ্ডির বাইরে সম্পর্ক বিস্তার এবং তা রক্ষা করার প্রয়োজনে অনেক আন্তর্জাতিক সনদে সম্মত হয়ে নিজের দেশে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার কারণেও আইন প্রণয়নে নতুনত্ব এসেছে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া আমাদের দেশীয় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও লেগেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও চুক্তির অনুবলে আমরা এখন এমন অনেক অধিকার দাবি করছি, যা দুই দশক আগে অনেকে ভাবতেও পারেননি।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে দেশের আইন প্রণয়ন ও এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। আমাদের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ক্ষমতা দখল এবং যে কোনো মূল্যে সেটি আঁকড়ে থাকা। ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে ন্যায়-নৈতিকতা মুখ্য বিষয় থাকে না। ফলে মাঝে মাঝেই আমরা নিবর্তনমূলক আইনের আবির্ভাব দেখি। এসব আইন প্রণয়নের পেছনে মূল উদ্দেশ্য থাকে সরকারের সমালোচনা কিংবা বিরোধিতা কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ। কেননা সমালোচনা প্রকারান্তরে জনমত গঠনে সহায়তা করে এবং সত্যিকার অর্থে এটি একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিতে সমালোচনা সহ্য করার ইতিহাস নেই বললেই চলে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো নিবর্তনমূলক আইন আমরা পেয়েছি এবং সেটি দ্বারা কেবল বিরুদ্ধমতের নিয়ন্ত্রণ নয়, যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অপক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে সেই কালো আইনের কিছু কিছু ধারা বিলুপ্ত হলেও কিছু কিছু ধারার ব্যবহার এখনো দেখা যায়। ২০১৩ সালে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে এই আইনের ১৬ নং ধারায় অজস্র মামলা হয়েছে। ১৬ নং ধারায় যে কোনো ধরনের ক্ষতিকর কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এটি মূলত সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। কাউকে হেয় করে রিপোর্ট প্রকাশের দায়ে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের আমলে এই ধারা বাতিল করা হলেও আইনটি বহালই থাকে। আইনের ২(চ) ধারা ‘ক্ষতিকর কাজ’-এর যে ব্যাখ্যা করেছে, বোঝার সুবিধার্থে তা হুবহু উল্লেখ করছি–

2(f) Prejudicial act means any act which is intended or likely-

(i) to prejudice the sovereignty or defence of Bangladesh;

(ii) to prejudice the maintenance of friendly relations of Bangladesh with foreign states;

(iii) to prejudice the security of Bangladesh or to endanger public safety or the maintenance of public order;

(iv) to create or excite feelings of enmity or hatred between different communities, classes or sections of people;

(v) to interfere with or encourage or incite interference with the administration of law or the maintenance of law and order;

(vi) to prejudice the maintenance of supplies and services essential to the community;

(vii) to cause fear or alarm to the public or to any section of the public;

(viii) to prejudice the economic or financial interests of the State;

একই ধরনের ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তী আইনগুলোতেও দেখছি। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনেও এর সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালাও একই পঙ্কিলতায় ঘূর্ণায়মান। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের বিষয়ে আপাতত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

যোগাযোগপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বিশ্বজুড়ে একে কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, কিভাবে এর ব্যবহারকারীদের আরো নিরাপত্তা দেয়া যায় এবং সর্বোপরি কিভাবে এর মাধ্যমে জীবনযাপন পদ্ধতি আরো সহজ করা যায়, সে উপলক্ষে বহু দেশে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরি ইংল্যান্ডেও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইন আছে। ভারতে এই আইন অনেক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। শিল্পে উন্নত দেশগুলোর ‘আউটসোর্সিং’-এর নির্ভরযোগ্য স্থান হিসেবে ভারত জায়গা করে নিতে পেরেছে। আইনি বিধি-বিধান তাদের প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিশাল তথ্যভাণ্ডার সবার নাগালের মধ্যে আসার পাশাপাশি ভার্চুয়াল জগতে নতুন নতুন অপরাধও জন্ম নিচ্ছে, যাকে আমরা সাইবার অপরাধ বলছি। এই অপরাধগুলো প্রথাগত অপরাপর অপরাধের ধারণার সাথে সম্পর্কহীন। আর্থিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে এই অপরাধ সংঘটনের পরিমাণ যেমন বেশি, তেমনি এর ধরনও দেশভেদে ভিন্ন। উল্লেখযোগ্য অপরাধগুলোর মধ্যে শিশু পর্নোগ্রাফি, ম্যালওয়্যার বা স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে কারো ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি, অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতি, তথ্য চুরি ইত্যাদি অন্যতম। যেমন–সাম্প্রতিক হলিউডের কয়েকজন অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত ছবি হ্যাক করে তা প্রকাশ করে দেয়া নিয়ে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে পরিণত

বয়স্কদের জন্য পর্নোগ্রাফি আইনসিদ্ধ হলেও এমন একটি দেশও পাওয়া যাবে না, যেখানে শিশু পর্নোগ্রাফিকে আইনি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তথ্যপ্রযুক্তিতে উৎকর্ষ লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে এর মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ধারা সংযুক্ত করে তথ্যপ্রযুক্তি আইন পাস হয়েছে। সে আইনের কোনো কোনো ধারা অতিমাত্রায় কঠোর হওয়ার কারণে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপও করতে হয়েছে। আমাদের দেশে এ রকম একটি আইন প্রণীত হয় ২০০৬ সালের শেষ ভাগে। ২০০৬ সালে এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে পরবর্তী ছয় বছর এই আইনের প্রয়োগ হয়নি কিংবা এ নিয়ে তেমন আলোচনাও শোনা যায়নি। কিন্তু আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখা সাপ একসময় না একসময় ছোবল মারবেই–এটি সবারই জানা।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৯০টি ধারার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের বা প্রযুক্তিনির্ভর পেশাজীবীদের যে অংশটির সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা তাদেরই প্রতিবাদ করার কথা থাকলেও তা কিন্তু হয়নি। বরং লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীরাই সোচ্চার হয়েছেন একটি নির্দিষ্ট ধারার বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি : ৫৭ ধারা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপছন্দের যে কাউকে দমন-পীড়ন চালানো যাবে। এতে মুক্তচিন্তার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং সবার মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করবে। এই আতঙ্কে থাকলে আর যা-ই হোক চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না, যা আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এবার আসা যাক শর্তগুলোর কথায় : ন্যায়সংগত আইনগত বিধি-নিষেধ, যেমন–রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, সামাজিক শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য বা নৈতিকতা, আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে উস্কানি দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য রাষ্ট্র বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে।

নিবর্তনমূলক আইনের বিপরীতে আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ হলো সংবিধান। কিন্তু স্বয়ং সংবিধান যেখানে ক্ষেত্রবিশেষে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ, সেখানে সংবিধানের আশ্রয় খোঁজা কতটুকু কার্যকর হবে তা সহজেই অনুমেয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ আমাদের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ৩৯ অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যায়, বাকস্বাধীনতা কোনো অবারিত স্বাধীনতা নয়, এখানে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আইন দ্বারা যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ' কে নির্ধারণ করবে? যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে, সেই সরকারের কাছে যা যুক্তিসংগত মনে হবে, সেই মতো বাধা-নিষেধ আরোপ করা হবে। এখানেই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সুযোগে নতুন নতুন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের পথ তৈরি হয়েছে।

৫৭ ধারা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপছন্দের যে কাউকে দমন-পীড়ন চালানো যাবে। এতে মুক্তচিন্তার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং সবার মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করবে। এই আতঙ্কে থাকলে আর যা-ই হোক চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না, যা আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাত সব সময়ই নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের মোক্ষম হাতিয়ার। বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আপেক্ষিক বিষয়, যা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া কূটনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্রের ভালোমন্দ মূল বিবেচ্য বিষয়। এই বিধানের ফলে ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্রের ব্যাখ্যায় ফেলে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, সীমান্তে অব্যাহত হত্যা, নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, বিনা মূল্যে ট্রানজিট দেয়াসহ আরো যেসব অন্যায্য সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য বা তথ্য প্রচার করা যাবে না। ভবিষ্যতে যদি কখনো সরকার পরিবর্তন হয়, তাহলে পাকিস্তানের জন্য একই নীতি প্রযোজ্য হলে তাদের মন রক্ষার্থে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করে সবাইকে খালাস দেয়া হলে নিশ্চয়ই বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষার অজুহাতে সবাই মেনে নেবে না। সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি ব্যবস্থা রয়েছে। আদালত অবমাননার জন্যও সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। মানহানি সংক্রান্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। দেখা যাচ্ছে, ৩৯ অনুচ্ছেদের বাধা-নিষেধগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বলা নেই। তাহলে এই অনুচ্ছেদের অনুকরণে যে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, তাতেও একই সমস্যা থেকে যাবে এটা নিশ্চিত।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৪ থেকে ৬৫ ধারা পর্যন্ত সাইবার অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই আইনে প্রথম মামলাটি হয় ২০০৮ সালে র‍্যাবের ওয়েবসাইট হ্যাক করার অভিযোগে। তবে এযাবৎকালে এই আইনে যত মামলা হয়েছে তার অধিকাংশই ৫৭ ধারায়। গত আগস্ট মাসেই এই আইনে মামলা হয়েছে অন্তত চারটি। বিগত ৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বোন ও প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদকে ভাগ্নে সম্বোধন করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইমরান হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের সূত্র দিয়ে প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, তথ্যপ্রযুক্তি আইনে ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে স্থানীয় এক যুবলীগ নেতা মামলা করার পর তাকে আটক করা হয়।

এবার দেখা যাক, কী বলা হয়েছে এই ৫৭ ধারায়। আলোচনার স্বার্থে ৫৭ ধারা হুবহু উদ্ধৃত করছি :

"ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড : (১) কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির

মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি অপরাধ। (২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ড কিংবা এক কোটি টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।"

বিগত ২১ আগস্ট ২০১৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ বলে এই আইনে সংশোধনী আনা হয়, যাতে এই ধারাটিতে পরিবর্তন এনে কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অন্যূন ৭ বছর এবং অনধিক ১৪ বছর করা হয়। ধারাটি প্রথম থেকেই ছিল জামিন অযোগ্য কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর সকল ধারাই ছিল অ-আমলযোগ্য। যার অর্থ দাঁড়ায়, ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই আইনে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না। নতুন সংশোধনীতে এই আইনকে আমলযোগ্য করায় পুলিশের উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকল না। পুলিশ চাইলেই যে কোনো সময় কাউকে এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গ্রেফতার করতে পারবে। এই ধারাটির প্রায়োগিক দিক ভালোভাবে বুঝতে হলে ধারাটির প্রত্যেকটি উপাদান বিশ্লেষণ করা দরকার–

(ক) এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল : এখানে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করার কথা বলা হচ্ছে, যা হবে মিথ্যা বা অশ্লীল। এখন দেখা যাক সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মিথ্যা বা অশ্লীল কোনো কিছু প্রকাশে বাধা আছে কি না। এতে নীতি বা নৈতিকতার কথা বলা হলেও 'মিথ্যা' কোনো কিছু প্রকাশে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। তবে সাধারণ মানেই ধরে নেয়া যেতে পারে, এটি উহ্য অবস্থায় হলেও আছে। কিন্তু এই আইনে কোথাও বলা হয়নি, কোন কোন বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বা মিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে আইনটি সুনির্দিষ্টতার অভাবের কারণে দুষ্ট। অথচ যে কোনো ফৌজদারি আইনে অভিযোগ হতে হবে সুনির্দিষ্ট। এতে পরিষ্কারভাবে বলা থাকতে হবে, যদি কেউ এমন কোনো কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন তাহলে তা হবে অশ্লীল ও মিথ্যা বক্তব্য।

(খ) সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন : এখানে ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনার ওপর অপরাধ হওয়া না হওয়ার বিষয়টিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষের বিবেচনা সমান হবে না। একজন ব্যক্তি একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে পারেন আবার একই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনো ব্যক্তি বিষয়টি আমলে না নিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হওয়া বলতে কী বোঝাবে তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই এই আইনে। বর্তমান সংশোধনীর পর পুলিশকে যেহেতু অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাই বলা যেতে পারে, যদি পুলিশের কাছে মনে হয় যে তিনি বা অন্য কেউ এ রকম কোনো বক্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করার ফলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন তাহলে তিনি এটিকে অপরাধ হিসেবে আমলে নেবেন!

(গ) যার দ্বারা মানহানি ঘটে : এটিও আইনের মূলধারার সাথে সংগতিবিহীন। যদি কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করে মিথ্যা ও অশ্লীল কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন তাহলে তার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অন্যূন ৭ বছর এবং সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত। অথচ কেউ যদি বই বা লিফলেট আকারে একই মিথ্যা বা অশ্লীল কোনো কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন তাহলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুযায়ী তিনি ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করবেন এবং এটি জামিনযোগ্য। নতুন আইনে এই অতিরিক্ত শাস্তির বিধান কেন রাখা হয়েছে তা নিয়ে আইনের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। আইনের অসমতা বিচারিক মানদণ্ডকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

(ঘ) আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় : ইন্টারনেটে কোনো কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করার ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে এই ভাবনাটাই অযৌক্তিক। কেননা বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, যেমন–ফেসবুক, টুইটার কিংবা বিভিন্ন ব্লগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা এতই নগণ্য যে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকরতঃ আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবেন এমনটি ভাবা কেবল উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই সম্ভব। নতুন আইনে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে বা ঘটছে কি না তা নির্ণয় করবে পুলিশ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের পুলিশ ইন্টারনেটে প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে কতটুকু সক্ষম? বা কতটুকু স্বাধীন?

(ঙ) রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় : এই আইনে কোথাও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বলতে কী বোঝাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। সুতরাং এই অস্পষ্টতার কারণে রাষ্ট্র নিজে ভাবমূর্তি সংকটে পতিত হয়েছে। এবার আসি ব্যক্তির ভাবমূর্তি বিষয়ে। কোনো বক্তব্যে বা এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করার ফলে কোনো ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি একই বক্তব্য বা এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করার ফলে অপর একজন ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না-ও হতে পারে। ভাবমূর্তি নির্ণয়ের যেহেতু কোনো মানদণ্ড নেই তাই এটি ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাচেতনার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অপর একটি গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ আচরণ করবে–এটা প্রত্যাশিত নয়।

(চ) ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে : এটিও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত একটি অপরাধ। 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে' পর্যন্ত রেখে যদি এই অনুভূতির ব্যাখ্যা দেয়া থাকত তাহলেও কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু যখনই বলা হচ্ছে 'আঘাত করতে পারে' তখনই অপরাধটি অনির্দিষ্ট হয়ে গেল। আর অনির্দিষ্ট কোনো অপরাধের কারণে আইন কোনো ব্যক্তিকে সাজা দিতে পারে না। অপরাধ অনির্দিষ্ট হওয়া মানে এই আইনের অপপ্রয়োগ করার রাস্তা খোলা রাখা। তদুপরি ব্যক্তির ধর্মচিন্তাও আপেক্ষিক বিষয়। কখন কোন কথায়, কী পড়ে, কার ধর্মচিন্তায় আঘাত লাগবে তা বলা মুশকিল। তাছাড়া ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার কারণে দণ্ডবিধির ২০৫ ধারায় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট আইন থাকতে নতুন করে এই আইনে অধিকতর শাস্তির বিধান রাখার মানে হলো, কেউ যদি বই লিখে বা লিফলেট আকারে কিছু প্রকাশ করে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেন তাহলে তিনি ২ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করবেন আর তিনি যদি একই কাজ ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে করেন তাহলে অন্যূন ৭ বছর এবং অনধিক ১৪ বছর পর্যন্ত

কারাদণ্ড ভোগ করবেন। এই অপরাধের ফল যদি একই হয় অর্থাৎ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হয় তাহলে একই অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির বিধান কেন?

এই ধারার সর্বশেষ উপাদানটি হলো–

(ছ) এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা : ব্যক্তির বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়ার অভিযোগ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া কিভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে? ফৌজদারি অপরাধ হলো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর এক ব্যক্তির কৃত অপরাধ। একজন ব্যক্তি একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে যখন অপরাধ করবেন তখন সেটির নমুনা কী হবে? বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইট রয়েছে এবং সেখানে তারা একে অপরের প্রতি যে ভাষায় লেখে তা প্রতিনিয়তই অন্যদের উস্কানি দেয় এবং সেটি যদি কোনো দলের কেউ অন্য দলের বিরুদ্ধে দাবি করে বসেন তাহলে সেই রাজনৈতিক দল যাদের ওয়েবসাইটে বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে বা সম্প্রচার হয়েছে তার বিরুদ্ধে, না যিনি বক্তব্যটি আপলোড করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হবে? উস্কানির ধরন কী হবে এবং কখন কোন বক্তব্যকে উস্কানি মনে করা হবে তার মানদণ্ড কী হবে, এ নিয়েও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনে কিছুই বলা হয়নি।

উপরে ৫৭ ধারার উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি কিন্তু এর আরো বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এগোয়নি। এবার সেটাই বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করব। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার পুলিশি ক্ষমতায়ন নিয়েই ইতিপূর্বে বলেছি, সেটিই সবচেয়ে শঙ্কার বিষয়। পুলিশের উপপরিদর্শকগণ ফৌজদারি অপরাধ তদন্তে মূল ভূমিকা রাখেন এবং এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট ব্যবস্থা। সে আমলে ব্রিটিশ পুলিশ উপপরিদর্শকগণ যে উদ্দেশ্য ও শাসনের ধ্যানধারণা নিয়ে নিয়োগ পেতেন, যার মূলে ছিল শাসনের নামে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখা ও জনগণকে দমন করা। পরিবর্তন ছাড়াই আমাদের মতো দেশগুলোতে ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে সফলভাবেই এই ব্যবস্থা এখনো চালু আছে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের নতুন বিধান অনুযায়ী পুলিশের ওপর অপরাধ আমলে নেয়া ও তদন্ত করার ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার কারণে যিনি কনস্টেবল থেকে পদোন্নতি পেয়ে উপপরিদর্শক (সব ক্ষেত্রে নয়) হয়েছেন, তাঁর অভিপ্রায়ের ওপর আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নির্ভর করতে হবে। এই আইনের অপরাধগুলো মূলত দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ হবে বিধায় এবং এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মত প্রকাশ পুলিশের বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করবে বিধায় পুলিশ কর্মকর্তার শিক্ষা ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অন্যায্য নয়। এছাড়া উপরমহলের উদ্দেশ্যমূলক অপব্যবহারের প্রশ্ন তো আছেই।

২০১৩ সালের সংশোধনীর পূর্বে ৫৭(২) ধারা মতে শাস্তির বিধান ছিল অনধিক ১০ বছর কারাদণ্ড এবং এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী সেই শাস্তির পরিবর্তন এনে কারাদণ্ডের পরিমাণ অন্যূন ৭ বছর থেকে অনধিক ১৪ বছর এবং এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়।

কেউ যদি বই লিখে বা লিফলেট আকারে কিছু প্রকাশ করে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেন তাহলে তিনি ২ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করবেন আর তিনি যদি একই কাজ ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে করেন তাহলে অন্যূন ৭ বছর এবং অনধিক ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করবেন।

এতটা কঠোর শাস্তির বিধান কেন? কেনই বা এই শাস্তির বিধান? সাইবার অপরাধ হচ্ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। কিন্তু কোন অপরাধটি সাইবার অপরাধ সেটি প্রথমে বুঝতে হবে। ভয়ংকর সব অপরাধের চেয়েও সাইবার অপরাধের শাস্তি এত কঠোর কেন? গত বছরের ২৪ নভেম্বরে তাজরীন গার্মেন্টসে মালিকের শাস্তিযোগ্য অবহেলার কারণে ১১২ জন শ্রমিক পুড়ে মারা যাওয়ার পরও তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয় না। অথচ ফেসবুকে কিংবা ব্লগে কেউ কিছু একটা লিখলেই তা যদি পুলিশের কিংবা অন্য কারো পছন্দ না হয় বা তিনি 'নীতিভ্রষ্ট হন বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হন' তাহলে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই গ্রেফতার করে অন্যূন ৭ বছর, অনধিক ১৪ বছর জেল খাটানো যাবে। কোন বয়সের ব্যক্তি কী কারণে, কোন মনস্তাত্ত্বিক বিচারে নীতিভ্রষ্ট কিংবা অসৎ হবেন তা নিতান্তই আপেক্ষিক বিষয়। দণ্ডের কঠোরতার কারণে, মিথ্যা মামলা দায়ের করার মাধ্যমে একে অপরকে ফাঁসানোর প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সাইবার অপরাধ কমার পরিবর্তে বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। যে কেউ ফেসবুকে অন্যের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে ৫৭ ধারার অন্তর্গত কোনো বিষয়ে কিছু লিখে পোস্ট করলেই ব্যস! শত্রুকে ঘায়েল করার অব্যর্থ অস্ত্র! ধরতে পারলেই হলো, জামিন হবে না। রাজনৈতিক বিচারে সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করায় যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে জামিন দিয়ে সমাজকে সংকটাপন্ন করে তুলতে কোনো বিচারকই চাইবেন না। তাছাড়া বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ক্ষমতার বিপরীতে আইন কখনো শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে না।

এ তো গেল কারাদণ্ডের কথা, কিন্তু এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড কেন? কোন বিচারে? কারাদণ্ডের পাশাপাশি অর্থদণ্ডের বিধানই বা কেন রাখা হয়েছে? তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা এতটাই অব্যর্থ যে, এতে কারো নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার সুযোগই নেই। কেননা যেহেতু আইনে অপরাধ নির্দিষ্ট নয় তাই এতে মনগড়া যে কোনো বিষয়কে বিচারের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে সাজা দেয়া সম্ভব। তাছাড়া পুলিশ যখন মনে করবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তখনই তার বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেয়া হবে, তাই এতে অপরাধ না করার যুক্তি ধোপে টিকবে না।

তবে ৫৭ ধারা মতে কেউ যদি অন্য কারো দ্বারা ইন্টারনেটে কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে কিছু প্রকাশ কিংবা সম্প্রচারের কারণে নীতিভ্রষ্ট হন বা অসৎ হন তাহলে তিনি কিভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? মানহানিও এই ধারার অন্তর্গত বিষয়, যেখানে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে ৫০৫ ও ৫০৫(ক) ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে– এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধী সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৩ ধারা মতে বিদ্যমান আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর কেনই বা চাইবে এক কোটি টাকা আর ৭ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সুযোগ না নিয়ে কেবল দুই বছরের বিধান সংবলিত ধারায় মামলা করতে?

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় যিনি অভিযোগ

আনছেন তাঁকেই অপরাধ প্রমাণ করতে হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি নিরপরাধ তা প্রমাণ করার বাধ্যবাধকতা নেই। মামলার অভিযোগের সাথে যে সকল বর্ণনায় অভিযোগ আনয়ন কিংবা দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হবে, তা কিভাবে হবে তা এই আইনের কোথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। আমার জানা মতে, ডিজিটাল এভিডেন্স হিসেবে যদি কোনো তথ্য ওয়েবসাইট থেকে মামলার সাথে সংযুক্ত করতে হয় তাহলে তা হুবহু অনুলিপি রেকর্ড করতে হবে এবং এর একটি কপি অভিযুক্তকেও দিতে হবে। অভিজ্ঞতা বলে, এযাবৎকালে এ ধারায় যত মামলা হয়েছে তার কোনোটাতেই এ নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে দালিলিক প্রমাণসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

এই আইনের ৬৯(৬) ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে বা নিজ উদ্যোগে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা মতামত নিয়ন্ত্রণ বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোনো মামলা পুনঃ তদন্তের এবং তদন্ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। এটি ফৌজদারি বিধানে সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধিতে অধিকতর তদন্তের বিধান থাকলেও পুনঃ তদন্তের কোনো বিধান নেই। সাইবার অপরাধের পুনঃ তদন্ত হলে অন্যান্য অপরাধের পুনঃ তদন্ত নয় কেন?

গত আগস্ট ২০১৪-এর সংশোধনীর ফলে ৮০ ধারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষেত্রে সেটি প্রকাশ্য স্থানে সংঘটনের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রকাশ্য কিংবা গোপনে যেখানেই অপরাধ হোক না কেন, পুলিশ তা আমলে নিতে পারবে। অথচ ভারতে ৬৬(ক) ধারায় পুলিশকে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য যে কাউকে গ্রেফতার করার বিধান থাকলেও এ বছরের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তা খর্ব করা হয়। বর্তমানে শহর হলে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ আর জেলায় হলে ডেপুটি কমিশনার অভিযোগ আমলে নিতে পারবেন। পরবর্তীতে সেদেশের সুপ্রিম কোর্টও এই নির্দেশের পক্ষে সায় দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে পুলিশের ক্ষমতা আরো বাড়ানো হয়েছে। নাগরিকের জীবনে পুলিশের হস্তক্ষেপ যত কম হয় সেদেশে নাগরিক অধিকার আরো সুসংহত হয়। আমাদের দেশে চলছে এর উল্টো রীতি।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ব্যতীত অন্য কোনো ধারায় এ পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হওয়ার বিষয়ে শোনা যায়নি। সাম্প্রতিক দুটো মামলায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করার সুবাদে এর প্রায়োগিক কিছু অসুবিধাও উপলব্ধি করেছি। যেমন–এখন পর্যন্ত এই আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। মাঝে একবার সংবাদপত্রে এ নিয়ে রিপোর্ট পড়লেও বাস্তবে এর অস্তিত্ব এখনো দেখা যায়নি। মহানগর দায়রা জজ এই আইনের বিধান মতে বিচারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাকে সাইবার অপরাধের বিচার চালানোর জন্য আলাদা কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। সাইবার অপরাধ বিষয়টিই যেখানে নতুন, সেখানে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে অস্পষ্টতা কিংবা বিভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম বাদে, আমাদের দেশে যে বয়সে একজন বিচারক 'জেলা জজ' হন তাঁরা সবাই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন কিংবা এই বিষয়ে সব কিছু জানেন, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। আমাদের আইনজীবীদের মধ্যে কত ভাগ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন কিংবা বোঝেন? তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই বা কে করবে? ফলে দেখা যাচ্ছে, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে তিনি সঠিক আইনি সহায়তা ও বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোনো আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।" আমাদের প্রাগৈতিহাসিক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থারই যেখানে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার দরকার, সেখানে আরো একটি নিবর্তনমূলক আইন নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক এবং পশ্চাদমুখী ভূমিকাকে আরো স্পষ্ট করছে। নাগরিকদের দাবি তাই স্পষ্টতই সংস্কার নয়, এই আইন বাতিল করতে হবে।

আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন যতটা না নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তার চেয়েও বেশি হলো নিয়ন্ত্রণের জন্য। নব্বই-পরবর্তী নৈর্বাচনিক স্বৈরতন্ত্র চালু থাকার কারণে নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়েছে, যা মূলত বিভিন্নভাবে স্বৈরতন্ত্র বিকাশের সহায়ক হয়েছে।

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে এর যেসব ক্ষতিকর দিক, যেমন–ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার (protection of privacy) কথা বিবেচনায় আনা হয়নি। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ব্যবহারগত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু ফেসবুক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারের বিধান রাখেনি। অথচ ভারতের আইনে ২০১১ সালে কমপ্লাইয়েন্স অফিসারের বিধান রাখা হয়েছে, যার কাছে প্রাথমিক অভিযোগ করা যায় কোনো অনলাইন তথ্য (Content violation) সরিয়ে ফেলার জন্য। তিনি যদি সেটি করতে ব্যর্থ হন তাহলে সেই অনলাইন ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ চাওয়া যায়।

বাংলাদেশে ফেসবুকে কোরান কিংবা কাবা শরিফের ছবি কারো অ্যাকাউন্টে ট্যাগ করে ইসলাম অবমাননার অজুহাতে শত শত মন্দির, বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে অথচ ফেসবুকের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন সম্ভব, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও করা যেত। কিন্তু আমাদের আইন নাগরিকের সুবিধার চাইতে নাগরিকদের দমন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী বলে সে দিকটা অন্য অনেক আইনের মতো এই আইনেও অনুপস্থিত।

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া: ব্যারিস্টার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ইমেইল:jyotirmoy.barua@outlook.com